ক) সুজিৎ চৌধুরী রচিত 'হারানো দিন হারানো মানুষ' গ্রন্থ অবলম্বনে বিধুভূষণ চৌধুরীর চরিত্রটি আলোচনা করো।

উত্তর : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিখ্যাত প্রাবন্ধিক সুজিৎ চৌধুরীর (১৯৩৭-২০০৯) *হারানো দিন হারানো মানুষ* (প্রথম পর্ব) গ্রন্থটিকে সেই সময়ের বাস্তব সমাজ এবং জীবনের এক জীবন্ত ঐতিহাসিক দলিল বলা যায়। এই গ্রন্থে লেখকের স্মৃতির পট থেকে একের পর এক অগণিত মানুষ উঠে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে লেখকের বাবা **বিধুভূষণ চৌধুরী**ও একজন। লেখকের দৃষ্টিতে পিতা বিধুভূষণ চৌধুরী একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। পেশায় তিনি শিক্ষক ছিলেন।

হারানো দিন হারানো মানুষ গন্থে দেখা যায়, বিধুভূষণ চৌধুরী শৈশবেই পিতাকে হারিয়েছিলেন। তাঁর শৈশব এবং কৈশোর কেটেছে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে। পিতাকে হারানোর পর তাঁর কিছুদিন কেটেছিল ঠাকুমার স্নেহের আশ্রয়ে। ঠাকুমাও তাঁকে একা রেখে পরলোকে চলে যান। জ্ঞাতিদের মধ্যে তাঁর এক খুড়তুতো ছোটো ভাই ছিলেন, তিনিও পিতৃহীন। তাঁদের পরিবারের বিষয়-সম্পত্তি যা ছিল তা-ও তাঁর ঠাকুরদাদার আমলেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যা-কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাতে কোনমতে দু'বেলার আহার চলত। হাইস্কুল ছিল বাড়ি থেকে দূরে বানিয়াচোঙ গ্রামে। বালক বিধুভূষণ চৌধুরীর হাতে টাকা-পয়সা ছিল না। আবার আত্মীয়-স্বজনও এমন কেউ ছিল না, যে তাঁকে সাহায্য করবে অথবা আশ্রয় দেবে। সেখানে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার কোন ঠিকানা ছিল না। সেই সময় তিনি বানিয়াচোঙে এসে জিতুমিয়ার এস্টেটের ম্যানেজার যোগেন্দ্রমোহন পালিতের বাড়িতে ছেলেদের পড়ানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেখানেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

যোগেন্দ্রমোহন পালিতের বাড়িতে সবাই বালক বিধুভূষণ চৌধুরীকে ভালবাসতেন। খুব শীঘ্রই তিনি তাঁদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে উঠেন। বিশেষ করে যোগেন্দ্রমোহন পালিতের বড় ছেলে জিতেন্দ্রমোহন পালিতের স্ত্রী সুহাসা পালিত তাঁকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করতেন। লেখকের মতে, সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের প্রথম সূচনা সম্ভবত সুহাসা পালিতের সাহচর্যেই হয়েছিল। পালিত বাড়ির আবহাওয়া ছিল অনেক উদার। জিতেন্দ্রমোহন

পালিত ছিলেন একজন খুব ভাল ডাক্তার। রিটায়ার হবার সময় তিনি সিভিল সার্জন ছিলেন। পেশায় ডাক্তার হলেও বিচিত্র বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল। ইতিহাসে ও ইংরাজি সাহিত্যে তাঁর গভীর দখল ছিল। আশি বছর বয়সেও তার হেরফের হয়নি। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "বিচিত্র সমস্ত বিষয় জানতেন তিনি--- হেস্টিংসের যুদ্ধের এমন বিবরণ দিয়েছিলেন একদিন যে আমার মুণ্ডু ঘুরে গিয়েছিল। তখন তাঁর বয়স আশি এবং আমি কলেজে ইতিহাস পড়াই। ওই বয়সেও শেক্সপিয়ার অনর্গল মুখস্থ বলতে পারতেন তিনি।" তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নানান বাহানায় লেগেই থাকতেন। তবে তা খেলাচ্ছলে। দুর্যোগের দিনে এই পালিত পরিবার বিধুভূষণ চৌধুরীকে বিভিন্নভাবে উপকার করেছিল। এই পরিবারের সাহচর্য পরবর্তী জীবনে চলার পথেও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

বালক বিধুভূষণ চৌধুরী পড়াশুনায় খুব ভাল ছিলেন। তাঁর স্কুলের হেড মাস্টার নগেন্দ্রকুমার দত্ত তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর জাবনে এই ভদ্রলোকের বেশ প্রভাব পড়েছিল। ভদ্রলোক ছিলেন শিলং-এর স্টেটস্ম্যানের প্রতিনিধি। পরবর্তী জীবনে বিধুভূষণ চৌধুরীর সাংবাদিকতার দিকে অগ্রসর হওয়ার পেছনে এই ভদ্রলোকের সাহচর্যই প্রেরণা জুগিয়েছিল। বিধুভূষণ চৌধুরী যখন ক্লাস সেভেনে পড়েন, তখন সরকারের কোন একটা বিভাগের তরফ থেকে গোটা হবিগঞ্জ মহকুমার ছাত্রদের মধ্যে একটা ইংরাজি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেই প্রতিযোগিতায় বিধুভূষণ চৌধুরী প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে একটি সোনার মেডেল উপহার দিয়েছিলেন। সোনার মেডেল লাভ করার পর স্কুলের মাস্টার মশাইরা তাঁকে আরো বেশি ভালবাসতেন এবং যত্ন করতেন। ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করার পরও তাঁর মাস্টার মশাইরা অনেক বেশি খুশি হতে পারেননি, কারণ তাঁরা বিধুভূষণ চৌধুরীর আরো ভাল রেজাল্ট আশা করেছিলেন।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর বিধুভূষণ চৌধুরী মুরারীচাঁদ কলেজে ভর্তি হন। এই সময় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কীভাবে হয়েছিল, তা জানা যায়নি। তিনি এ বিষয়ে কখনো কিছু বলেননি। তাঁর টিউটোরিয়েল খাতা থেকে বোঝা যায়, প্রথম বছর তিনি ঠিক ভাবেই ক্লাস করেছিলেন। টিউটোরিয়েল ক্লাসে তিনি খুব ভাল ভাল নম্বর পেতেন। তবে সে সময় তাঁর পড়াশুনায় বাধা আসে। আই এ ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক পূর্বে গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়, পড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি সেই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। সেকালের প্রভাবশালী ছাত্রনেতা, যাঁরা রাজনীতিতে নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তাঁরা হলেন,---

কালীরমণ ভট্টাচার্য, সুধাংশুকুমার শর্মা, দ্বারিকা গোস্বামী। এঁদের সবার দ্বারা বিধুভূষণ চৌধুরী গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা একটা সাহিত্য পত্রিকা বের করেছিলেন, সেই পত্রিকাটার নাম ছিল-'মৈত্রী'। সুধাংশু শর্মা ছিলেন সেই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। তখন বিধুভূষণ চৌধুরী ছিলেন প্রকাশক। পরবর্তী সময়ে সুধাংশু শর্মার মৃত্যুর পর বিধুভূষণ চৌধুরী এবং অশোকবিজয় রাহা পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় একটি দল সিলেট থেকে নোয়াখালি গিয়েছিলেন। বিধুভূষণ চৌধুরীকে সেই দলের নেতা করা হয়েছিল। বিজ্ঞ কোন নেতাকে প্রবীণ ব্যক্তিকে দলনেতা নির্বাচন না করে, একজন তরুণকে এই গভীর দায়িত্ব প্রদান করার জন্য সে সময়ের অনেকেই আশ্চর্য হয়েছিল। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বিধুভূষণকে খুব ভালবাসতেন। এই সিদ্ধান্তটি তিনিই গ্রহণ করেছিলেন। বিধুভূষণ চৌধুরীর নেতৃত্বে দলটি হবিগঞ্জ পৌঁছানোর পর একটি সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় বিধুভূষণ চৌধুরী প্রথম গান গেয়েছিলেন। হেমাঙ্গ বি শ্বাসের আত্মজীবনীতে এর উল্লেখ আছে।

নোয়াখালি থেকে ফিরে আসার পর বিধুভূষণ চৌধুরীর বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু বিয়েটা তখন হয়ে ওঠেনি। বিয়ে হবার পূর্বেই তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। জেল থেকে ফিরে আসার পর (পাঠশালা পাশ) সুপ্রভা চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এ বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন তাঁর বন্ধু প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়। বিয়ের পর তিনি স্ত্রীকে নিয়ে সিলেট চলে আসেন। আন্দামান জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বিপ্লবী বীরেন সেন তখন একটা স্বদেশী ব্যাঙ্ক খুলেছিলেন, বিধুভূষণ চৌধুরী সেই ব্যাঙ্কে চাকরি নেন। খড়তুতো ভাই রমেশ মেট্রিক পাশ করার পর, তিনি তাকে নিজের কাছে এনে কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন। সেখানেই বাসা নিয়ে তাঁরা বাস করছিলেন। তবে, এখানেও তিনি স্থায়ীভাবে বাস করতে পারেননি।

১৯৩২ সালে আইন অমান্য করে কংগ্রেসের বিরাট মিছিল বের হয়েছিল। সেই মিছিলে বিধুভূষণ চৌধুরীর স্ত্রী সহযোগ করেছিলেন। গোর্খা সৈন্যরা মিছিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, অনেকেই তাতে আহত হন। তাঁদের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনারায়ণও ছিলেন। মিছিল তেকে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে বিধুভূষণ চৌধুরীও একজন। এবার তাঁর দেড় বছরের জেল হয়। তাঁকে তখন যোরহাটে পাঠানো হয়েছিল। সুপ্রভা চৌধুরী চলে যান তাঁর মাতার কাছে। জেলের মেয়াদ শেষ করে যখন বিধুভূষণ চৌধুরী বে লেন, তখন তিনি

নিঃস্ব। তিনি ছাত্রজীবনে প্রাপ্ত সোনার মেডেলটা পঁচিশ টাকায় বিক্রি করে কেনাকাটা করে বানিয়াচোঙে যান। সেখান থেকে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা চলে যান।

কলকাতায় গিয়ে বিধুভূষণ চৌধুরী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ফরোয়ার্ড পত্রিকায় যোগ দেন। তখন তাঁর জীবনে দুটো ঘটনা ঘটে। --

এক. পুলিশ তাঁকে একটা স্বদেশী ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে ফেলে। এই ব্যাপারে সন্দেহবশত পুলিশ যাদের গ্রেফতার করেছিল, তাঁদের একজনের কাছে পুলিশ তাঁর ঠিকানাটা পেয়েছিল। পুলিশের সন্দেহ ছিল, সেই ডাকাতদের ডাকাতি করার জন্য বিধুভূষণ চৌধুরী তাদের পিস্তল সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। একদিন রাতে পুলিশ তাঁকে তাঁর মেস থেকে ধরে নিয়ে যায় ভবানীভবনে। সেখানে পুলিশ তাঁকে উদয়াস্ত জেরা করে। তাঁর মেসে তন্ন তন্ন করে তলাশী অভিযান চালানো হয়। সেখানে কিছু পাওয়া যায়নি। কলকাতায় তিনি যতদিন থাকবেন, প্রতিদিন একবার করে থানায় এসে হাজিরা দিয়ে যাবেন, এই শর্তে পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দেয়।

দুই. নৌকা করে গঙ্গা পার হবার সময় লাফিয়ে পাড়ে উঠতে গিয়ে তাঁর শরীরে খুব জোরে ঝাঁকুনি লাগে। এর ফলে তাঁর শরীরে গাঁটে গাঁটে ব্যথা শু হয়। এর পর থেকে প্রতিদিনই জ্বর হতে থাকে। ফরোয়ার্ড পত্রিকার পরিচালকদের একজন ছিলেন, ডাক্তার বিধান রায়। তিনি তাঁকে দেখালেন। রোগের লক্ষণ দেখে তাঁর বোন টিবি বলে সন্দেহ হয়। তাঁর কাছ থেকে লম্বা ঔষধ এবং পথ্যের ফর্দ পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, পুরো বছরের মাইনে দিয়েও এ রোগের চিকিৎসা করানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বিপদের গভীরতার আভাস পেয়ে তিনি তাঁর বন্ধু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যকে রোগের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে একটা চিঠি লেখেন। চিঠির উত্তরে তিনি জানান, "তোমার অসুখ আমি ভাল করে দেব, তুমি দেশে চলে এস।"– একদিকে পুলিশের ঝামেলা অপরদিকে রোগের যন্ত্রণা ; অনেক চিন্তা করে তিনি কলকাতা ত্যাগ করে বানিয়াচোঙে ফিরে আসেন।

প্রিয়নাথবাবুর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় পনেরো দিনেই তাঁর রোগ সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়ে যায়। এবার অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি সিলেট যাবেন বলে স্থির করলেন। সুপ্রভা চৌধুরীর মাতা অর্থাৎ তাঁর শাশুড়ী মাতা বুঝতে পারলেন, সিলেট যাওয়া মানেই আবার জেল। তখন তিনি নিজে সিলেটে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কন্যার এবং জামাইয়ের সংসার জীবনের দুরবস্থার কথা তাঁকে জানান। তিনি তাঁকে বোঝাতে চেয়েছিলেন,

জেলে না গিয়েও তো দেশের কাজ করা যায়। আর এভাবে জেলে জেলে কাটালে তাঁর কন্যার সংসার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। সেই কথার ফলস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বিধুভূষণ চৌধুরীকে ব্রজনাথ হাইস্কুলে মাস্টারির চাকরি দিয়ে পাইলগাঁও-এ পাঠিয়ে দেন।

বিধুভূষণ চৌধুরী থাকতেন স্কুলের লাগোয়া কোয়াটারে। বর্ষাকালে সেই গ্রাম জলের নীচে চলে যেত। স্কুল বিল্ডিংটা বাদ দিয়ে চতুর্দিক জলে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। প্রায় ছয় মাস সেখানকার মানুষ নৌকা যোগে যাতায়াত করতো। আশ্বিনের পর থেকে জল ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেত। স্কুলে যাবার জন্য হাঁটা পথটিও ধীরে ধীরে খুব সুন্দর রূপে তৈরি হয়ে যেত। অনেক ছাত্র প্রায় সাত-আট মাইল হেঁটে স্কুলে আসত। গ্রাম থেকে শহরে যেতে হলে প্রায় ন' মাইল হেঁটে বাস ধরতে হত সেরপুর থেকে। একবার বিধুভূষণ চৌধুরী সাত বছরের সুজিৎ চৌধুরী এবং তাঁর দাদাকে নিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেকালে গ্রামের ছেলেদের হাঁটতে পারাটা ছিল একেবারেই স্বাভাবিক। কিন্তু সাত বছরের ছেলে এতটা হাঁটতে পারবে কিনা, সেটা ভাবার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেননি। গ্রামের কাঁচা সড়ক ধরে দীর্ঘপথ চলার প্রশিক্ষণ ছেলেবেলায় লেখক বাবার কাছ থেকেই নিয়েছিলেন।

সুপ্রভা চৌধুরীর মায়ের মা, অর্থাৎ লেখকের 'দিদিমণি' জামাইয়ের বাড়িতেই থাকতেন। জামাইয়ের তরফ থেকে কোনদিন কোন ধরনের অসুবিধা তাঁর হয়নি। সাধারণত একটি পরিবারে একজন মা যেভাবে বাস করেন, তিনিও ঠিক সেই ভাবেই তাঁদের পরিবারে থাকতেন। তিনি সারাক্ষণ মেয়ে (সুপ্রভা চৌধুরী) এবং মেয়ের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মেয়ে পেরে উঠবে না, চিন্তা করে সর্বক্ষণ মেয়ের কাছে কাছে থাকতেন। দিদিমণি মারা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্রজনাথ হাইস্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে বিধুভূষণ চৌধুরী সেখানে এগারো বছর কাটিয়েছেন। সেখানে তাঁর পাঁচ ছেলের জন্ম হয়েছে। তাঁরা দিদিমণির আদরে পুষ্ট হয়েই বড় হয়েছেন।

ব্রজনাথ হাইস্কুলে বিধুভূষণ চৌধুরী ইংরেজি পড়াতেন। বাড়িতেও তিনি তাঁর সন্তানদের পড়াশুনার দিকে নজর দিতেন। ছেলেবেলায় বই পত্রের প্রতি লেখক সুজিৎ চৌধুরীর বেশ আকর্ষণ ছিল। ব্যাপক হারে দাদাদের বই ছিঁড়তে শু করেন তিনি, সেটা লক্ষ করে পিতা বিধুভূষণ চৌধুরী বালক সুজিৎ চৌধুরীকে 'বর্ণবোধ' এনে দিয়েছিলেন। সেই বইটা অবশ্য তিনি ছিঁড়ে ফেলেননি। পিতাপ্রদত্ত সেই বই দিয়েই বালক সুজিৎ চৌধুরীর পড়াশুনা আরম্ভ হয়। তিনি বাবার পকেট থেকে যেদিন চকের ছোট ছোট টুকরো আবিষ্কার করলেন, যেদিন

থেকে পোড়ামাটির পেন্সিল দিয়ে স্লেটে লেখা ছেড়ে দেন। সেই বয়সেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পোড়ামাটির পেন্সিলের লেখার থেকে চকের লেখা বেশি গাঢ় এবং ধবধবে সাদা। বালক সুজিৎ চৌধুরীর কাছে সেটা বেশি আকর্ষণীয় ছিল। পিতা বিধুভূষণ চৌধুরীর এ বিষয়ে সমর্থন ছিল না। তিনি বলতেন, এতে হাতের লেখা পোক্ত হয় না। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন, “বাবার মতে এতে হাতের লেখা ঠিকঠাকভাবে পোক্ত হয় না।”--- বাবার এ কথার মর্ম লেখক বড় হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর হাতে তাঁর বাবা প্রথম পূর্ণাঙ্গ যে বইটি তুলে দিয়েছিলেন, সেটা ছিল, ‘ঠাকুরমার ঝুলি’। বইয়ের দোকান থেকে তাঁর বাবা যখন বইটি কিনেছিলেন, দোকানদার বালক সুজিৎ চৌধুরীকে ‘হাসিখুশি’ প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ উপহার দিয়েছিলেন। ‘নবনীতি সুধা’ গ্রন্থটিও তাঁর বাবাই তাঁকে কিনে দিয়েছিলেন। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, এই সমস্ত বইগুলি অবশ্যই ছোট্ট সুজিৎ চৌধুরীর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তথাপি তাঁর বাবা এই বইগুলি ছেলেকে কিনে দিয়েছিলেন। এখান থেকে অনুমান করা যায়, তাঁর বাবার অন্তর্দৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টি অনেক গভীর ছিল।

সুজিৎ চৌধুরীর ইংরেজি অক্ষর এবং বানান শেখা তাঁর বাবার কাছে হয়েছিল। এছাড়াও বাবাই বাড়িতে তাঁকে অঙ্ক শেখাতেন। এভাবে একবছর বাড়িতে পড়ানোর পর বাবা তাঁকে হাইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্কুলে বিধুভূষণ চৌধুরী ইংরেজি পড়াতেন। ইংরেজিতে লেখক খুব কাঁচা ছিলেন না। বাবার ক্লাসে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তেন। বাবার প্রশ্নে উত্তরে তিনি জানা বানানও অশদ্ধ বলতেন। একদিন বাবার প্রশ্নের উত্তরে তিনি ‘ক্লাস’ বানানটি তিন রকমভাবে বলেছিলেন কোনটাই শুদ্ধ ছিল না। স্কুলের সব ছেলেকে বিধুভূষণ চৌধুরী সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। নিজের ছেলে বলে কখনো সুজিৎ চৌধুরীকে ভালবেসে বেশি নম্বর দিতেন না, উল্টো অন্য ছাত্রদের তুলনায় অর্ধেক নম্বর কম করে দিতেন। বালক বয়সে তাঁর ছাত্রগুলি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে সেটা তাঁর পছন্দ ছিল না। বিড়ি খাওয়ার অপরাধে তিনি একজন ছাত্রকে চড় মেরেছিলেন।

স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও বিধুভূষণ চৌধুরীর সুসম্পর্ক ছিল। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা হলেন, হেডমাস্টার যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার আব্দুল সোভান সাহেব, দিগিন্দ্র আচার্য প্রভৃতি। তাঁদের পাশের অপর দুটি কোয়াটারে থাকতেন স্কুলের হেডমাস্টার যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী এবং দিগিন্দ্র আচার্য তাঁদের পরিবার নিয়ে। এই তিনিটি পরিবার একসঙ্গে ছিল একে অপরের প্রতিবেশী। তাঁদের পারিবারিক সম্পর্কও ছিল খুব

RITADEY

গভীর, আন্তরিক এবং খাঁটি। লেখক আমাদের জানিয়েছেন, যতীন্দ্রমোহন বাবুর বাড়িতে যশোদানন্দন গোস্বামীর কীর্তন শুনে বালক বয়সে সুজিৎ চৌধুরী মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়াও এই দুই পরিবারের সম্পর্কে গ্রন্থে লেখক বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন।

স্কুলে খুব ভাল একটা লাইব্রেরি ছিল। বিধুভূষণ চৌধুরী স্কুলের লাইব্রেরির জন্য এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা আনার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তখন সেই সেটটার দাম ছিল সম্ভবত হাজার টাকা। সেই কথা স্কুল কমিটিকে জানানোর পর, স্কুলের সেক্রেটারি ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী টাকাটা দিতে সম্মত হন। বিধুভূষণ চৌধুরীর চেষ্টাতেই সেই স্কুলের লাইব্রেরিতে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা এসেছিল। আরও একটি গু ত্বপূর্ণ কথা হল, তিনি একজন গল্পকারও ছিলেন। তাঁর 'অসামাজিক' গল্পটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বিধুভূষণ চৌধুরীর চেষ্টা এবং সুজিৎ চৌধুরীর সাধনার ফলেই সুজিৎ চৌধুরী জীবনে সফল হতে পেরেছিলেন। বলতে পারা যায়, সুজিৎ চৌধুরীর লেখক সত্তার বীজও তাঁর পিতার কাছ থেকে জন্ম সূত্রে পাওয়া। বিধুভূষণ চৌধুরী তাঁর শাশুড়ি মাতার কাছে একজন ভাল এবং আজ্ঞাকারী জামাই ছিলেন, স্ত্রীর কাছে দায়িত্বশীল স্বামী, সন্তানদের কাছে একজন আদর্শ পিতা, ছাত্রদের কাছে একজন আদর্শ শিক্ষক এবং সর্বোপরি একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন। পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দী দেশমাতৃকার মুক্তি র জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন।

আলোচনা শেষ করার পূর্বে খুব সংক্ষেপে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল,---

ক) সেকালে পড়াশুনায় উৎসাহ বাড়ানোর জন্য রচনা লেখার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত। বিজেতাকে সোনার মেডেলও উপহার হিসেবে দেওয়া হত। (ইংরেজি রচনা প্রতিযোগিতায় সোনার মেজেল পেয়েছিলেন বিধুভূষণ চৌধুরী)

খ) অর্থ সংকটে আবদ্ধ এবং আশ্রয়হীন কিশোরকে বিপদের দিনে সহৃদয় গ্রামবাসীরা সাহায্য করতেন।

গ) কলেজে পড়তে হলে গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে হত।

ঘ) স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য সেকালের কলেজের ছাত্ররা অনেক সময় পড়াশুনা ছেড়ে দিত।

ঙ) শহরে ব্যয়বহুল এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বেশি জনপ্রিয় হলেও গ্রামে কম খরচের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যথেষ্ট লাভদায়ক ছিল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় গ্রামবাসীরা সুফল লাভ করতেন।

চ) মেয়েরা খুব কম পড়াশুনা করত। (পাঠশালা পর্যন্ত)

ছ) সেকালে ছাত্রদের পড়িয়ে শিক্ষিত ছেলেরা অর্থ উপার্জন করতো।

জ) সাংবাদিকতাও একটা ভাল পেশারূপে সেকালে বিবেচিত হত।

ঝ) শিক্ষিত লোকেরা সেকালে ব্যাঙ্কে কাজ করে অর্থ উপার্জন করতেন।

ঞ) স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যখন তখন জেলে যেতে হতো। তাঁদের মধ্যে অনেকে আন্দামান জেলেও গিয়েছিলেন।

ট) বিধুভূষণ চৌধুরী পত্রিকা সম্পাদনার কাজও করেছিলেন।

ঠ) বিধুভূষণ চৌধুরী ভাল গান গাইতে পারতেন।

ড) বিধুভূষণ চৌধুরী একজন গল্পকার ছিলেন।

---- বিধুভূষণ চৌধুরীর জীবনের মধ্য দিয়ে লেখক সেকালের অতি কঠিন এবং কষ্টকর গ্রামের জীবন, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের ভূমিকা--- ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা তাঁর এই গ্রন্থে দিয়েছেন। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকে সহযোগিতা করতেন। এ বিষয়েও বিধুভূষণ চৌধুরী এবং তাঁর পরিবারের অবস্থা থেকে সেকালের স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারদের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে পারা যায়।--- এই সমস্ত বিষয়ে লেখকের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত *হারানো দিন হারানো মানুষ* গ্রন্থটি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিখ্যাত প্রাবন্ধিক সুজিৎ চৌধুরী তাঁর *হারানো দিন হারানো মানুষ* গ্রন্থে অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধরনের মানুষ এবং তাদের জীবন-ধারণ পদ্ধতির বাস্তব এবং

বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর পিতা বিধুভূষণ চৌধুরীও তাঁদের মধ্যে একজন। পিতার প্রতি ভালবাসা এবং অকৃত্রিম ভক্তি-শ্রদ্ধা মিশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গি সবার থাকে, এক্ষেত্রে লেখক সুজিৎ চৌধুরীও ব্যতিত্রম নন। তথাপিও তিনি পারিবারিক আসক্তি, মোহ, পক্ষপাতিত্ব দোষ--- ইত্যাদি ত্যাগ করে তাঁর পিতা বিধুভূষণ চৌধুরীর পরিচয় বাস্তবসম্মতভাবে এই গ্রন্থে দিয়েছেন, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

RITA DEY